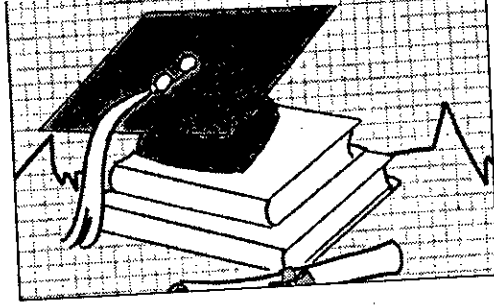


ডিন নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। শিক্ষকের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, গবেষণা ও প্রকাশনার ভিত্তিতে বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষকরা পর্যায়ক্রমে অনুবাদের ডিন হবেন। তিনি বিভাগীয় প্রধানদের কর্মপরিকল্পনায় সহায়ক হবেন এবং তাদের সঠিক নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করবেন। এসবের আংশিক কার্যকর হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় স্বায়ত্তশাসন ও স্বশাসন যেমন নিশ্চিত হবে, তেমনি তার সঙ্গে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কর্মনিষ্ঠা প্রথিত হবে।

স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই স্বশাসনের ধারণাটি কিন্তু সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইনে কিংবা ২০১০ সালের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনেও সন্নিবেশিত আছে। তাদের সিনেট না থাকলেও কিংবা ডিন নির্বাচনের প্রথা না থাকলেও সহকর্মীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে বিশদ কোন কার্যবিবরণ নেই কিংবা নীতি-নৈতিকতার বিষয়টি অনুপস্থিত। রোল মডেল বা পথিকৃতির খারাপ উদাহরণ ও আচরণগুলোই তারা রপ্ত করে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ধারা সংক্রমিত হয়। কারণ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও জীবনবোধ এখনও সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রথিত হচ্ছে। এসব বিষয়ে পরিবর্তন কঠিন ও কষ্টসাধ্য। তবে পূর্ব ও পশ্চিমের অনেক দেশে ডিন মডেল বা রোল মডেল পরিবর্তন করেই শিক্ষার মানোন্নয়নে কামা ফলাফল পাওয়া গেছে।

দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বত্তা রয়েছে, যদিও স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে তার প্রখরতা কম। কিন্তু যে হারে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে প্রথমোক্তদের



উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষক ও শিক্ষা- কর্মকর্তাদের ভূমিকা

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

মাঝেই এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে ও হবে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বিভাগের শিক্ষক নিজের কর্মস্থল ছাড়াও বিকল্প কর্মস্থলে পাঠদান, মূল্যায়নে ও পরামর্শদানে দীর্ঘ সময় ব্যয় করছেন। তারা ক্রিডের কর্মস্থলে গবেষণা ও প্রকাশনার মাধ্যমে যতটা উপার্জন বা তরুণী করছেন বিকল্প ক্ষেত্রে। তার চেয়ে বেশি উপার্জন বা তরুণী করছেন বিকল্প ক্ষেত্রে। তার ফলে শুধু গবেষণা নিরুৎসাহিত হচ্ছে না, একজন শিক্ষক ৭টি খাতা দেখা ৯ মাসে শেষ করতে পারেননি বলে অভিযোগ রয়েছে। অথচ সেই শিক্ষকই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত রেটিং পেতে এমন সব কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছেন যা কিনা তার প্রথম কর্মক্ষেত্রে মানকে অনেক উর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারতেন। তজ্জন্য সরকারী-বেসরকারী সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্ম সময় বেঁধে দেয়া, কর্ম বর্ণনা সঠিক করে দেয়া এবং ভাল কর্মের জন্য পুরস্কার, খারাপ কর্মের জন্য তিরস্কার নিশ্চিত করার সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।

সরকারী-বেসরকারীসহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাসের আকার বিশাল। এত বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে গতানুগতিক ধারায় শিক্ষাদান নিষ্ফল হতে বাধ্য। শিক্ষার কাজে তথ্যপ্রযুক্তির উদ্ভাবন ব্যবহার এ সঙ্কট কিছুটা নিরসন করেছে, কিন্তু উচ্চ মেধার উচ্চশিক্ষিত ও সুদক্ষ শিক্ষক ছাড়া জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞান সৃষ্টি উভয়ই বিঘ্নিত হচ্ছে। অর্থাৎভাবে শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিঘ্নিত হচ্ছে।

অর্থাৎভাবে নিয়োজিত শিক্ষকের বড়জোর ৪৩ শতাংশকে আবাসিক সুবিধা দেয়া যাচ্ছে। বেতন-ভাতা বৃদ্ধির পরও তাদের বেতনের ৫০ ভাগের বেশি বাসা ভাড়ার জন্য ব্যয় হচ্ছে। শিক্ষকদের আবাসন ব্যবস্থা করা না গেলে তাদের জন্য উচ্চহারে আবাসন ভাতা দিতে হবে। তবে নিম্ন মেধা কিংবা রাজনৈতিক আশীর্বাদপুষ্ট কিংবা শিক্ষক-কর্মচারীদের অযোগ্য সম্মানাদিকে নিয়োগ দেয়া বর্জন করতে হবে। তাদের সামাজিক মর্যাদা যেমন নিম্নগামী, তেমনিভাবে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, তাদের বেতন-ভাতাদি ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন শিক্ষকদের তুলনায় কম। শিক্ষকদের বেতন ও ভাতাদি সমমানের সরকারী কর্মচারীদের চেয়ে বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। নাইজিরিয়ার মতো দেশেও শিক্ষকদের তুলনামূলক বেশি হারে বেতন-ভাতা ও সামাজিক মর্যাদা দেয়া হয়। এ ব্যাপারে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি অত্যাৱশ্যক। আরও অত্যাৱশ্যক হচ্ছে বিদেশে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিতদের জন্য দেশে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে স্বল্প সময়ের জন্য যোগ্য শিক্ষক আনা যেতে পারে, যারা উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন ও গবেষণাকর্মে সমর্থন দিতে পারবেন।

উচ্চতর শিক্ষা শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা, জ্ঞান, ডিন মূল্যবোধ সৃষ্টি, গবেষণার মান ও পরিধি বিস্তৃত করে এবং তা প্রকাশের শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যাপক সহায়ক হয়। তাই সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায়ের উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দিতে হবে, যেগুলো শুধু এমফিল, পিএইচডি বা সমমানের শিক্ষা দেবে। ৪ বছর-মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রম প্রচলনের পর মাস্টার ডিগ্রী প্রাপ্তির ইদুরদৌড় বন্ধ করতে হবে। এখানকার সাশ্রয় ও সম্পদ এমফিল বা পিএইচডি সৃষ্টিতে নিয়োজিত করা উচিত।

আমাদের দেশের অনেক যোগ্য শিক্ষক বিদেশে অবদান রেখে চলেছেন। এখন না হলেও অবসরের পর তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোন কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষা-কর্মকর্তা বা সরকারী কর্মকর্তাদের সম্মানজনক নিয়োগ দিয়ে সুফল পাচ্ছে। ইউজিসি ইতোমধ্যে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের চিন্তা-ভাবনা করছে। স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদোন্নতির পরই কর্মস্থল পরিবর্তনের বিধান তৈরি করা যায়।

বিশ্বশালীদের শিক্ষায় অবদান ও আত্মনিয়োগের পথ অবধারিত করতে হবে। তারা যাতে শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প, ট্রাস্ট, ফান্ড বা দাতব্য প্রয়াসে ব্রতী হতে পারে, তজ্জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ইতোমধ্যে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের উপস্থিতি দৃশ্যমান, তবে মুনাফার

মানসিকতাসম্পন্ন যে কোন উপস্থিতি সমাজ ভাল চাখে দেখবে না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বশালীদের শিক্ষা ও সমাজকল্যাণে অবদানের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তাদের সামাজিকভাবে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তনীদের শিক্ষা উন্নয়নে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে সুফলপ্রাপ্তি শুধু সময়ের ব্যাপার।

কর্মচারী-কর্মকর্তাদের ব্যাপারে উদাসীনতা

উচ্চশিক্ষা তথা শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল স্তরের কর্মকর্তাদের ভূমিকা কদাচিৎ আলোচিত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যমতে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৪৮৪ ও ২৬৮৮০ জন। কর্মচারীদের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৩৯৩৯ জন এবং ৬১৮০ জন। সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা প্রায়শই রাজনৈতিক আনুকূল্যে বহিরাবাসিত, যার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতিবাজ শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যদের বর্ধিতভাবে তাদের ভূমিকা অনেক। অথচ শিক্ষার মানোন্নয়নে তাদের ভূমিকা একান্তই ইতিবাচক হতে পারত যদি তারা নিয়মনিতির মাধ্যমে নিয়োজিত ও বর্ধিত হতো।

আমার মতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র কর্মকর্তাদের নিয়োগলগ্নে যোগ্যতা ও দক্ষতা শিক্ষকদের মতোই হতে হবে। তাদের পদায়নে মূল্যবোধ ও মনোভঙ্গি পরীক্ষা আবশ্যিক। তাদের বেতন-ভাতাদি স্তরভেদে শিক্ষকদের সমান হলেও উচ্চপদে আসীনে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অপেক্ষা চাকরির মেয়াদই বিবেচনায় নেয়া হয়। অথচ উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে তাদেরও উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অপরিহার্য।

অনেক কারণেই তাদের সঙ্গে শিক্ষকদের স্বন্দ্ব রয়েছে। যার ফলে শিক্ষকদের উদ্ভাবিত অনেক সদিষ্টা অপূর্ণ থেকে যায়। সম্প্রতি তাদের কোথাও কোথাও বিশেষত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। কিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষককে কর্মকর্তার দায়িত্ব দিচ্ছে এবং যোগ্য কর্মকর্তাকে শিক্ষকের দায়িত্ব দিচ্ছে। তাতে অন্তর্ভুক্তি ও সম্পৃক্ততা ত্বরান্বিত হচ্ছে, স্বন্দ্বের পরিমাণ কমছে এবং শিক্ষালগ্নের উন্নয়নে যৌথ ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে।

এ্যাক্রিডিটেশন আইনের কাস্কিত ভূমিকা

ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির অবিশ্বরণীয় কীর্তি বলে যা চিহ্নিত হতে পারে তা হলো এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন সংসদে পাস। এই আইনটি নির্মোহ, নির্ভর ও নিরপেক্ষভাবে কার্যকর করা হলে এখানে মানোন্নয়নে সরকার ও ইউজিসির ভার অনেকটা কমে যাবে। তখন সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা মানোন্নয়নে স্বউদ্যোগী হতে বাধ্য হবেন। এক্ষেত্রে সরকার ও ইউজিসিকে নিয়ন্ত্রক নয়, বাস্তবের ভূমিকায় অবশ্যই অবতীর্ণ হতে হবে।

উপসংহার

এই নিবন্ধে আমরা কতিপয় সংস্কারের কথা উল্লেখ করেছি, যার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বসহকারে শিক্ষক ও কর্মচারীদের নির্বাচন এবং পদোন্নতির কথা বলা হয়েছে। এসবের চেয়ে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন আইন ও অধ্যাদেশ সংশোধনের সুপারিশ রয়েছে। এ যাবত গৃহীত সরকারী পদক্ষেপের মধ্যে এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইনটি বোধ হয় উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে সমধিক ভূমিকা রাখতে পারবে, যদি তা নির্মোহ, নিরুদ্বেগ ও নিরপেক্ষতা নিয়ে পালিত হয়।

(সমাপ্ত)

লেখক : বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও উপাচার্য, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

ব্যানবেইস পরিচালকের কার্যালয়	
প্রাণি নং.....	
তারিখ.....	
চীফ: পরিসংস্থাপন বিভাগ	
চীফ: ড.এ.পি. বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
নিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	
স্বাক্ষর	